বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন
(Bangladesh and International Organization)

ইউনিট ১১

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার ওপর ভিত্তি করে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সকল রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি ও রূপরেখা তৈরী করে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন সার্ক, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-এর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ সার্ক (SAARC)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সার্ক কি ও এবং এর লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ কি কি তা বলতে পারবেন।
- সার্কে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সহযোগিতা, প্রস্তাব, সহযোগী, পর্যবেক্ষণ, লক্ষ্য, সনদ, শীর্ষ, সম্মেলন, কনভেশন

SAARC বা South Asian Association for Regional Cooperation দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সংগঠন। দক্ষিণ এশিয়া একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ও বৈচিত্রময় জনপদ। দক্ষিণ এশিয়ায় ৮টি দেশের জনসমষ্টি একত্রে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ। দেড় শত কোটির অধিক মানুষের এ অঞ্চল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তসম্পর্ক তেমন জোরদার না হওয়ায় আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে সার্কের সফলতা তেমন উজ্জল নয়। বাংলাদেশ সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী রাষ্ট্র। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু।

সার্ক সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৮১ সালে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে সাতটি দেশের সরকার

প্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকায় এটি গঠিত হয়। সার্কের বর্তমান সদস্য দেশ ৮টি। দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। আফগানিস্তান সার্কের সর্বশেষ সদস্য। সার্কের পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা ৭টি, এগুলো হচ্ছে; চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

সার্কের লক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ-

১. জনজীবনের মানোন্নয়ন : অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন হচ্ছে সার্ক সনদের প্রধান লক্ষ্য।

২. যৌথ স্বয়ম্ভরতা অর্জন : সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৭টি দেশের একই সাথে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা।

৩. আস্থা ও সমঝোতা সৃষ্টি : সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রভৃতি দূর করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতা সৃষ্টি করা।

৪. যৌথ কার্যক্রম সূচনা : অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির লক্ষ্যে যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়িত করা।

৫. পারস্পরিক সহযোগিতা : সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন করে সহযোগিতার বন্ধনকে দৃঢ় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রকে উত্তরোত্তর প্রসারিত করা।

৬. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান।

সার্কের সাংগঠনিক কাঠামো

সার্ক সনদে এ সংস্থার জন্য পাঁচ স্তরবিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। যথা: রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিট, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি এবং, ৫. সার্ক সচিবালয়

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

সার্কের সহযোগিতার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারিত হয়েছে ১. কৃষি, ২. স্বাস্থ্য ও জনসেবা, ৩. আবহাওয়া, ৪. ডাকসেবা, ৫. মাদকদ্রব্য পাচার ও অপব্যবহার রোধ, ৬. পল্লী উন্নয়ন, ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮. ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, ৯. টেলিযোগাযোগ, ১০. যাতায়াত ও যানবাহন, ১১. নারী উন্নয়ন, ১২. অডিও ভিজুয়াল বিনিময়, ১৩.সংগঠিত পর্যটন, ১৪. ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, ১৫.স্কলারশীপ ও ফেলোশিপ, ১. দারিদ্র্য বিমোচন, ১৭. পরিবেশ, ১৮. সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, ১৯. যুব স্বেচ্ছাসেবক বিনিময়, ২০.আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয় এবং ২১. এনজিও বিষয়ক।

সার্ক ও বংলাদেশ

সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা হলেন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। মূলত বাংলাদেশের তৎপরতা এবং উৎসাহে অপরাপর দেশসমূহের সহযোগিতায় গঠিত হয় এই আঞ্চলিক সংস্থাটি। তাই সার্কে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন সম্মেলন ও বৈঠকে রেখেছে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৮৭ সালের ৪ নভেম্বর কাঠমন্ডুতে স্বাক্ষরিত হয় 'সন্ত্রাস দমন' সম্পর্কিত সার্ক আঞ্চলিক কনভেনশন ও সার্ক খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চুক্তি। যেখানে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০ সালের ৩ নভেম্বর মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে স্বাক্ষরিত হয় সার্ক মাদক সংক্রান্ত কনভেনশন। মালদ্বীপের এই চুক্তির উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ। অন্যদিকে, ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয় 'সার্ক প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সাপটা)' এবং সার্ক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাক্ষরিত হয় সমঝোতা স্মারক। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে স্বাক্ষরিত হয় দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সাফটা। সাফটা ও সন্ত্রাস দমন সম্পর্কিত সার্ক আঞ্চলিক কনভেনশনের উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সংগঠন যা ১৯৮০ সালে গঠিত হয়। সার্কের উদ্যোক্তা বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সার্কের বর্তমান সদস্য দেশগুলো হল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন হচ্ছে সার্কের প্রধান লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সার্কের সদস্য নয় কোন্ রাষ্ট্রটি?

ক. নেপাল খ. মালদ্বীপ গ. মিয়ানমার ঘ. ভূটান

২। সার্ক গঠিত হয়েছে-

(i) পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে

(ii) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে

(iii) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে

নিচের কোনটি সঠিক-

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.২ জাতিসংঘ (The United Nations)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিশ্বশান্তি, বিরোধ মীমাংসা, আটলান্টিক সনদ, পরিষদ, মানব উন্নয়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও মানবজাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে জাতিপুঞ্জ সে লক্ষ্য রক্ষা করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আকাঙ্খা। যার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হতে বিশ্বকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশ্ব নেতারা উপলব্ধি করে এমন একটি কার্যকর সংস্থার যা জাতিসমূহের বিরোধ মীমাংসায় সফল ভূমিকা পালন করবে। এই চিন্তা থেকেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ১৯৪১ সালে ঘোষণা দেন আটলান্টিক সনদের। যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। একাধিক শীর্ষ বৈঠক করেন এসব রাষ্ট্রের সরকার প্রধানরা। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে মিলিত হয়ে জাতিসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। একই বছরের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ অক্টোবরকে তাই জাতিসংঘ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের মোট পাঁচটি কার্যকর পরিষদ রয়েছে। এগুলো হল-

ক. সাধারণ পরিষদ
খ. নিরাপত্তা পরিষদ
গ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
ঘ. আন্তর্জাতিক আদালত এবং
ঙ. জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি অদ্বিতীয় সংগঠন হিসাবে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক হিসাবে জাতিসংঘকে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘ কোন বিশেষ সরকার বা কোন একক জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। জাতিসংঘ হল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একটি সমিতি, যা তার সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। নিম্নে জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, যুদ্ধ বা শান্তিভঙ্গের যেকোন সম্ভাবনা রোধে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা। প্রয়োজনে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
৪. প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি এবং তা সমুন্নত রাখা।
৫. বিশ্বব্যাপী মানব জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাবলীর সমাধানে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।

জাতিসংঘের সফলতা: বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘের সৃষ্টি। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘ উল্লেখ্য যোগ্য বিরোধ মামীংসা করেছে এবং প্রতিরোধ করেছে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, দারিদ্র বিমোচন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় জাতিসংঘের জুড়ি মেলা ভার। বিশ্ব ব্যাপী মারণাস্ত্র রোধ, বলকান গণ হত্যার বিচার, আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা: জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এখনও বিশ্বের ক্ষুদা, দারিদ্র, বৈষম্য ও যুদ্ধ রয়েছে। বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যা, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যা, উত্তর কোরিয়া সমস্যাসহ আরও নানা ধরনের বিষয় অমীমাংসিত আছে। দেখা দিয়েছে নতুন অনেক সমস্যা। যার অনেকগুলোই নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে বড় সংস্থা জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি মানব উন্নয়ন জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৫টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। সদস্যপদ প্রাপ্তির পর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নেও জাতিসংঘের ভূমিকা প্রসংশনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হল ....।

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান ও চীন
(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও জার্মানি
(গ) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন
(ঘ) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও চীন

২। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার কারণ কি?

(i) নিরাপত্তা রক্ষা
(ii) সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
(iii) কূটনীতি রক্ষা
(iv) বৃহৎ শক্তির স্বার্থ রক্ষা

নিচের কোন্‌টি সঠিক-

(ক) i
(খ) ii
(গ) i ও ii
(ঘ) i ও iv

পাঠ-১১.৩ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক (Relation between UN and Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অঙ্গ সংগঠন, উন্নয়ন কর্মসূচী, শান্তিরক্ষী, শরণার্থী ক্যাম্প, প্রকল্প

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬ তম সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। অবশ্য এর বহু আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন যেমন- UNCTAD, UNDP, WHO - ইত্যাদিতে যোগদান করে। বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্ককে দুইভাগে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবিক সহযোগিতা প্রদান

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন প্রদান না করলেও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লাখ লাখ শরণার্থী বাঙালিকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। এদেশের জনগণ আজও তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর দেশের বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তর সাহায্যকল্পে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবিক তৎপরতা শুরু করে। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. স্বাস্থ্য সেবা কর্যক্রম

বাংলাদেশে সবার স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (Work Health Organization)। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কমিটি ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা পানি ও পয়:নিষ্কাশন, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপের মাধ্যমে UNICEF কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তের উচ্ছেদ ঘোষণা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১৩ বছরব্যাপী কর্মসূচি চালানোর পর এ সাফল্য অর্জিত হয়।

৩. দুর্যোগ ও মহামারী মোকাবেলা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতিবছর বন্যা, অতিবৃষ্টি লেগেই আছে। বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, টর্নেডো, মহামারী এসব দুর্যোগময় মুহূর্তে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ দুর্যোগ দেখা দিলে জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশেও তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

৪. বাংলা ভাষার মর্যাদা দান

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে আমাদের দেশের ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষণ দেন। জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" পালনের ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে।

৫. বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘের United Nations Development Programme (UNDP)-এর অবস্থান শীর্ষে। দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের মতো ৫টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপসহ বাংলাদেশস্থ UNDP-এর ১৯৯৯-২০০১ সালের সাহায্যের পরিমাণ ৮৫ মিলিয়ন ডলার। এগুলোর মূলকথা হল লাগসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় UNDP কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৬. খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে

খাদ্য ঘাটতি লাঘব এবং জরুরি কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জরুরি ত্রাণ কাজে WFP ৪০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে FAO-এর প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় শতাধিক।

জাতিসংঘের বিভিন্ন পদে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছে এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ESCAP- এর নির্বাহী সচিবের পদমর্যাদায় ১৯৮১-৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি টি এইচ খান International Criminal Tribunal-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে, প্রয়াত স্পীকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Human Rights Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। শান্তি মিশনেও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুস সালাম UN Peace Keeping Mission-এর কমান্ডার হিসেবে ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের প্রধান সামরিক লিয়াজোঁ অফিসার পদে ব্রিগেডিয়ার রেজাউল হায়দার দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের লাখ লাখ শরণার্থীকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছে এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘের UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগময় মুহূর্তে জাতিসংঘ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

ক. ১৩৬ খ. ১৩৭ গ. ১৩৮ ঘ. ১২৭

২। বাংলাদেশে উন্নয়নে সাহায্য প্রদানকারী জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে-

ক. ইউনেস্কো খ. ইউএনডিপি গ. ইউএনএইচআর ঘ. এফএও

পাঠ-১১.৪ বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা (Role of Bangladesh in UN Peacekeeping Forces)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- জাতিসংঘে যেসব মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে সেসবের নাম বলতে পারবেন।
- জাতিগত সহিসংতা নিরসনে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের অনুসৃত কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিরোধপুষ্ট, মিশন, যুদ্ধবিরতি, বিশ্বশান্তি, রসদ-সরঞ্জাম, শান্তিসেনা

শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন দেশের বাহিনীর অংশগ্রহণকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বলা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তির্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি কার্যকর বিধি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে শান্তিরক্ষী মিশন প্রেরণ করা হয়। শান্তিরক্ষা কর্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সদস্য দেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সরবরাহ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শান্তিরক্ষী মিশনগুলো কাজ করে। জাতিসংঘ সনদের ৪৩ ও ৪৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে কাজ করে। সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ গত প্রায় সাত দশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বব্যাপী পরমাণু ও মারণাস্ত্রের বিকাশ রোধে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে মূলত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শুরু। এর পর থেকে প্রায় ১১৫টি সদস্য রাষ্ট্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ৮ লক্ষাধিক সদস্য কাজ করেছে। সম্প্রতিকালেও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শান্তিরক্ষী মিশন কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিন, কঙ্গো, ইরিনিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, সেনেগাল, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, পূর্ব তিমুরসহ ৪৮টি রাষ্ট্রে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ দায়িত্ব পালনকালে ১৬৫০ জনের মতো শান্তি সেনা মারা গেছেন। এদের জনবল, সরঞ্জাম ও রসদ যোগান দিয়েছে বিশ্বের ১৮০টি দেশ। জাতিসংঘের *Department of Peacekeeping Operations (DPKO)*এর তথ্য মতে (মার্চ, ২০১৬),১৬টি মিশনে ১২৮টি দেশ থেকে ১ লাখ ১৮ হাজার শান্তি সেনা কর্মরত আছে।

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

বিগত চার দশক ধরে শান্তিরক্ষা মিশনে বিশেষ অবদান রাখছে বাংলাদেশ। এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রধান বা সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষ দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের তথ্য মতে, জাতিসংঘের ১০টি রাষ্ট্রের ১১টি মিশনে বাংলাদেশের প্রায় নয় হাজার সৈন্য নিয়োজিত আছে। *Bangladesh Armed Forces Division*এর তথ্য মতে, বাংলাদেশ ১৯৮৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪০ টি রাষ্ট্রে ৫৪টি শান্তি মিশন কার্যক্রমে শান্তিসেনা প্রেরণ করেছে। আর তাতে অংশ নিয়েছে সশস্ত্রবাহিনীর (সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী) সর্বমোট ১,১৯,৯৮০ জন সদস্য। শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। এই মহান কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কঙ্গো, সিয়েরালিওনসহ বেশ কয়েকটি

রাষ্ট্রে বাংলাদেশের কয়েক শত সেনাসদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। বাংলাদেশী সেনাদের আত্মত্যাগ বিশ্ব সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে, যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করেছে।

জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে-

- যুদ্ধ ও অস্ত্র বিরতি কার্যকরকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিবদমান গ্রুপগুলোর মাঝে অবস্থান এবং উত্তেজনা প্রশমন।
- নিবৃত্তিমূলক সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের পরিবেশ তৈরি করা।
- যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিবদমান গ্রুপগুলোকে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করা।
- সমস্যা উত্তরণে বিবদমান রাষ্ট্রে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।
- যুদ্ধবিরতি শেষে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে প্রশাসন পরিচালনা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদান।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ভূমি মাইন অপসারণ ও অন্যান্য স্থাপনা পুনর্গঠন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ কি কি দায়িত্ব পালন করে?

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বহু দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন থেকে শুরু করে জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থা থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থা আনয়ন, মানবিক ত্রাণ তৎপরতা, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও তা তদারকি, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশের সেনারা কাজ করছে। এসব কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী জাতিগত যুদ্ধ ও সহিংসতা কমিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ শান্তি মিশনে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করে কোন্ সালে?

ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৮৮ গ. ১৯৮৯ ঘ. ১৯৯১

২। জাতিসংঘ সনদের কোন্ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করে?

ক. ৪৩ ও ৪৪ খ. ৪৪ ও ৪৫ গ. ৪৩ ও ৪৭ ঘ. কোনটি নয়

পাঠ-১১.৫ কমনওয়েলথ (The Commonwealth)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কমনওয়েলথ এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সঙ্গে কমনওয়েলথ-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উপনিবেশ, কর্মসূচি, সচিবালয়, সহযোগিতা, মানব উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কৃতি, স্থগিত

সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত স্বাধীন ও আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত দেশগুলোর (যারা এখন স্বাধীন) আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম। শিক্ষার উন্নয়নে কমনওয়েলথয়ের ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা দান, পল্লী উন্নয়নকে কমনওয়েলথ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মূলত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে কমনওয়েলথয়ের মাধ্যমে সহায়তা দান করে বৃটেন। কমনওয়েলথ (Commonwealth) -এর পূর্বনাম ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্ (Brithsh Commonwealth of Nations)। ১৮ নভেম্বর ১৯২৬ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্ ধারণার পত্তন হয়। ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন 'স্ট্যাচু অব ওয়েস্ট মিনিস্টার'-এ উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৯ সালের ২৮ এপ্রিল লন্ডন ঘোষণা অনুযায়ী আধুনিক কমনওয়েলথের আত্মপ্রকাশ। তখন সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্ করা হয়। ১৯৬৫ সালের আগে কমনওয়েলথের কোনো সবিচালয় ছিল না। ১৯৬৫ সালে লন্ডনের মার্লবরো হাউসে কমনওয়েলথ সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মর্যাদা লাভ করে।

কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ: কমনওয়েলথয়ের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। নিম্নে অঞ্চল ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হল-

আফ্রিকা (১৮) : ক্যামেরুন, বতসোয়ানা, গাম্বিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা, লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, মালাবি, মরিশাস ও সিচেলেস।

উত্তর আমেরিকা (১২) : কানাডা, এন্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামা, বার্বাডোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও বেলিজ।

এশিয়া (৮) : বাংলাদেশ, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভারত ও শ্রীলংকা।

দক্ষিণ আমেরিকা (১) : গায়ানা।

ওশেনিয়া (১১) : অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, ভানুয়াতু, নাউরু, নিউজিল্যান্ড ও টুভ্যালু।

ইউরোপ (৩) : ব্রিটেন, সাইপ্রাস ও মাল্টা। এর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীন বহির্ভূত সদস্য মোজাম্বিক (১৯৯৫)। বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করে ১৮ ফিব্রুয়ারি ১৯৭২। বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের জন্য পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে ১৯৭২ সালে। কমনওয়েলথ ত্যাগকারী দেশ আয়ার‍্যাণ্ড (১৯৪৬ সালে) ও জিম্বাবুয়ে (৭ ডিসেম্বর ২০০৩)। কমনওয়েলথের বিশেষ সদস্য নাউরু (৯ জানুয়ারি ২০০৬-বর্তমান) বর্তমানে সদস্যপদ স্থগিত ফিজির (৮ ডিসেম্বর ২০০৬-বর্তমান)।

কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা: ১৯৬৫ সালে লন্ডনে কমনওয়েলথের সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কোন সংবিধান নেই। ১৯৭১ সালে সিঙ্গাপুর সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্র সমূহ কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা সমূহ হলঃ

১. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ও সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা,
২. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্থন,
৩. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং
৪. বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস ও গণতন্ত্রায়ণ।

এসব নীতিমালার আলোকে কমনওয়েলথ সদস্যগণ একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ, রপ্তানি বাজার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ও কারিগরী সহায়তা, কৃষি পণ্য উৎপাদনে সহায়তা, গবেষণা, দারিদ্র্য বিমোচন, বর্ণ বৈষম্য রোধ, গণতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি।

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের মূল রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ১৯৭১ সালে গ্রেট বৃটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষত, বিবিসি, লন্ডন টাইমস, দ্য সান, গার্ডিয়ান, মিরর পত্রিকা স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালি জনগণের উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছিল। বৃটেনসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের জন্য ব্যাপক সাহায্য দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো অকাতরে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে। স্বাধীন দেশ হিসাবে কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে ১৯৭২ সালেই দ্রুত স্বীকৃতি দেয়। এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছিল। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনীতি ও সরকার-বিরাধীদলের দাঙ্গাপূর্ণ সম্পর্ক অবসানে বিভিন্ন সময় কমনওয়েলথ মহাসচিব মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	কমনওয়েল্থ গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সাবেক বৃটিশ উপনিবেশভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে কমনওয়েলথ গঠিত। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। বৃটেনের রাণী এই সংস্থার প্রধান। ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ গুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্‌টি সত্য নয়?
ক. বেলফোর ঘোষণা কমনওয়েলথ এর ভিত্তি খ. কমনওয়েলথের সচিবালয় লন্ডনে
গ. কমনওয়েলথের কোন সংবিধান নেই ঘ. ৫৯ টি রাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য

২। কোন্ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

পাঠ-১১.৬ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) কখন এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলতে পারবেন।
- ওআইসির লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন।
- ওআইসির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্মেলন, নিন্দা, সমর্থন, ভ্রাতৃত্ববোধ, আগ্রাসন, স্বাধীন রাষ্ট্র, ফিলিস্তিন, ইসলাইল, ন্যায়সঙ্গত

ওআইসি (OIC) এর পূর্নরূপ হল Organization of Islamic Conference। বাংলায় ''ইসলামী সম্মেলন সংস্থা।'' ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল অতর্কিতে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৪ টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালের সৌদি আরবের জেদ্দায় তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ওআইসি'র একটি খসড়া সনদ অনুমোদিত হয়। শুরু হয় ওআইসি'র যাত্রা।

ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় ও জোরদার করা এবং ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রদান, সমগ্র বিশ্বের সংগ্রামরত মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি সমর্থন দেয়া, ও.আই.সি. ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদান প্রভৃতি সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য।

ওআইসি-বাংলাদেশ সম্পর্ক

বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠী মুসলিম। তারপরও কয়েকটি কারণে বাংলদেশকে মুসলিম বিশ্বে নিজের স্থান করে নিতে সময় লাগে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের ভ্রান্ত ধারণা এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনই এর জন্য প্রধানত দায়ী। 'সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া এবং হিন্দুপ্রধান ভারত ইহুদীদের যোগসাজশে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গেছে'- এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রদান করেছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এ ধারণার পরিবর্তন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৭৪ সালের লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক জনশক্তি প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায়। এ থেকে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এছাড়া ওআইসির অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কও রয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা, উন্নয়ন প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ এসব রাাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে।

ও.আই.সি.'র সদস্য হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ তার বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে এটা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ ও.আই.সি. এর সদস্য হওয়ার পূর্বেও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরবদের প্রতি সমর্থন জানায় এবং ইসরাইলের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানায়। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসরাইলী দখল থেকে আরব ভূমি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ আকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত

করে আসছে। মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ধারাবাহিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গঠিত ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস্ বা জেরুজালেম বিষয়ক কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৮০ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু হলে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করে সেখানে বাংলাদেশ সদস্যরূপে কাজ করে। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি গাজীপুরে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় ও জোরদার করণের লক্ষ্যে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রদান করতে মুসলিম বিশ্ব ওআইসি প্রতিষ্ঠা করে। একইসঙ্গে সংস্থাটি সদস্য দেশসমূহের মধ্যকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা এবং পাকিস্তানের অপপ্রচারের কারণেই মুসলিম বিশ্ব শুরুতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে দ্বিতীয় ছিল। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এই সংকট ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে। বর্তমানে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ওআইসি (OIC) এর পূর্ণরূপ কি?

ক. Organization of Islamic Countries খ. Organization of Islamic Council

গ. Organization of Islamic Communities ঘ. Organization of Islamic Conference

২। ওআইসির উদ্দেশ্য হল-

(i) বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিলোপ করা (ii) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা

(iii) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

নিচের কোনটি সঠিক-

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বিকভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও প্রগতির ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘ জন্মলাভ করেছে। তাই জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য জাতিসংঘ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। সর্বক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সার্থক-এ কথা বলার অপেক্ষা

রাখে না। বাংলাদেশ তার আন্তরিকতা ও ক্ষমতা নিয়ে জাতিসংঘে কাজ করছে। আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করেছে শান্তিরক্ষা মিশন কার্যক্রমে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের বেশ কিছু অঙ্গ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক. জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার পটভূমি লিখুন।

খ. জাতিসংঘের শান্তি মিশন কার্যক্রমের লক্ষ্য কী?

গ. বাংলাশের উন্নয়নে জাতিসংঘ কিভাবে অবদান রাখছে?.

ঘ. শান্তি মিশন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২। উলপুর গ্রামের কৃষকরা একটি বৃহত্তর সমবায় গড়তে পার্শ্ববর্তী সাতটি গ্রামের কৃষকদের একটি প্রস্তাব দেয়। তারপর আটগ্রামের মোড়ল, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা একদিন বিকালে এই সমবায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় বসে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় সমবায়টি কেবল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে একে অপরকে তথ্য ও সহযোগিতা দেবে। তারা একটি সমন্বিত সেচ-ব্যবস্থা চালু করারও সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এই ব্যাপারে একমত হয় যে, গ্রামগুলো এবং এই সমবায় কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেনা। সমবায়ের দপ্তরটি উলপুর গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ক. সার্ক এর পূর্ণরূপ কী?

খ. ও আই সি এর সদস্য রাষ্ট্র কয়টি?

গ. উদ্দীপকের সংখ্যাটিকে আঞ্চলিক কোন সংস্থার সাথে তুলনা করা যায়? সংস্থাটির কয়েকটি উদ্দেশ্য লিখুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি ক্ষেত্রে সার্কের সহযোগিতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫ : ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬ : ১। ঘ ২। খ